বুদ্ধ বাণী ও বৌদ্ধ আচরণ

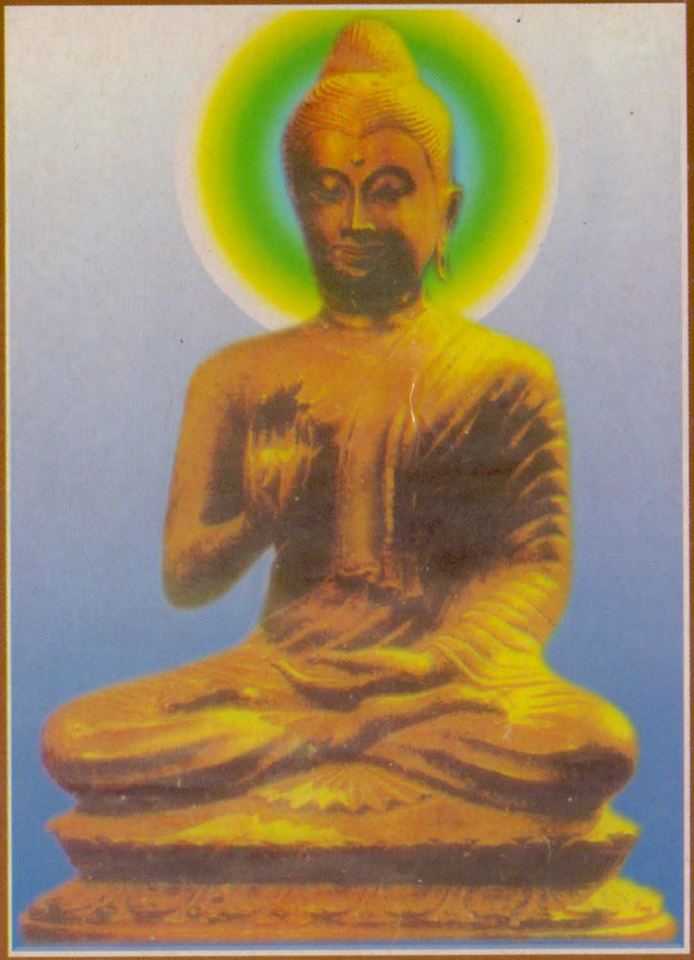

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvananda Bhante

দায়িত্ব দিয়ে গেছেন কিনা বুদ্ধের অবর্তমানে ত্রিপিটক রক্ষা করার জন্য আমার জানা নেই। তন্ত্র বিদ্যার প্রভাব বুদ্ধের ধর্মের নামে অতি সম্প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোগ ব্যাধি সারানোর নামে সরল প্রাণ মানুষদের কাছ থেকে বুদ্ধ পূজার খরচের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। শীল ভাবনার কথা বলে বিনয় বহির্ভূত কার্য্যাদি আচরিত হচ্ছে। প্রাচীন অরহতদের ধাতু দর্শন সহজতর করা হচ্ছে। লাল রং মিশ্রিত সুচ ফুটে শরীর রঞ্জিত করা তন্ত্রমন্ত্র বিদ্যা নহে কি? বুদ্ধের ধর্মে এসব দিক নির্দেশনা আছে কি? বর্তমানে বিবিধ জটিল রোগের ঔষধও গুরু শিষ্যদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। দেবতারা নাকি এসব ঔষধপত্র তাঁদেরকে বিলি করার জন্য দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন গৃহীদের জন্য পঞ্চশীল অথচ গুরুদের দীক্ষামন্ত্রে তিন শীলের গুরুত্ব বেশী, যেমন–

১। গরু এবং মহিষের মাংস না খাওয়া (বুদ্ধ যে দশ প্রকারের মাংস নিষেধ করেছেন তাতে গরু মহিষের মাংস উল্লেখ নেই।)

২। ব্যাভিচার না করা এবং

৩। নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা।

জগৎজ্যোতি গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ত্রিলোকের গুরু এবং জগতে গৃহীদের জন্য পঞ্চশীল নির্দেশ করে গেছেন এবং পঞ্চশীল বিশুদ্ধভাবে পালন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এজন্য বুদ্ধের ধর্ম এবং বৌদ্ধদের আচরণের পার্থক্য আমাদের জানতে হবে। বুদ্ধের ধর্ম না জানলে এবং এর চর্চা না করলে দিন দিন বৌদ্ধদের অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং মুক্তিমার্গে বিচরণ করাও দুস্কর হবে। সম্যক দৃষ্টি এবং মিথ্যা দৃষ্টি পরস্পর বিপরীত ধর্মী। জ্যামিতির ভাষায় যাকে বলা হয় 'পেরালেল' (সমান্তরাল) অর্থাৎ কোন দিন এ দুই জিনিস এক বিন্দুতে উপনীত হবে না। গৌতম বুদ্ধ সম্যক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন সর্বজ্ঞাতা ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। এতে নবনব বৌদ্ধদের নিজস্ব মনগড়া ধর্ম আবিস্কার করে মুক্তির পথ দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে অন্ততঃপক্ষে আমি মনে করি না। তন্ত্রমন্ত্র ঝাঁড় ফোকি দিয়ে রোগ ব্যাধি সারার চেয়ে তথাগতের নির্দেশ মত বারানসীর ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট যে ধর্ম দেশনা করেছেন এবং যে ধর্ম প্রবর্তন করেছেন "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র ও মহাস্মৃতিপ্রস্থাপন সূত্র" অনুসরণ করে জীবন যাপন করলেই তো দুঃখ থেকেমুক্তি লাভ করা সম্ভব। ধরে নিলাম আমি একজন রোগী। শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা আমি প্রতিনিয়ত ভোগ করছি। আমি এ দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই। তজ্জন্য

চিকিৎসকের সরণাপন্ন হয়ে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ পথ্য গ্রহণ করে সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভকরি। আমি বলব তথাগত বুদ্ধ জগতে একজন দক্ষ সর্ব বিদ্যায় এবং জ্ঞানে পারদর্শী একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর (বুদ্ধ) আবিস্কৃত ধর্মই হচ্ছে চিকিৎসার উপদেশ মাত্র।

এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আমার এ রোগ ব্যাধি কেন হয়েছে, এর কারণ কি? এর কি কোন কারণ আছে? নাকি কোন অদৃশ্য শক্তি এসব রোগ ব্যাধি আমার উপর উনি অসন্তুষ্ট হয়ে চাপিয়ে দিয়েছেন? এসব প্রশ্নের সমাধান তথাগত বুদ্ধ চতুরার্য সত্যে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ১। জগতে দুঃখ আছে, জগত দুঃখময় এবং দুঃখ পরিপূর্ণ, ২। এসব দুঃখের পেছনে কারণ আছে এবং সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, জগতে কারণ ছাড়া একটি ক্ষুদ্র বালুকণাও নড়চড় করে না। ৩। এসব দুঃখকে রোধ করা যায় অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব এবং ৪। এসব দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে চলা।

অতএব আমাকে বুঝতে হবে আমার এসব শারীরিক এবং মানসিক দুঃখের কারণ হচ্ছে আমার কৃত কর্মের ফল। যে কর্ম হয়ে গেছে সেগুলো চিন্তা করে লাভ নেই এবং নতুনভাবে আর যেন অকুশল কর্ম সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। তজ্জন্য বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করা সর্ব জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা এবং সদা সর্বদা স্মৃতি ভাবনায় রত থাকা। তাহলে নতুনভাবে অকুশল উৎপন্ন হবে না এবং সঞ্চিত অকুশল কর্মও অকার্য্যকর হবে এবং এটাই হচ্ছে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার আসল ব্যবস্থাপত্র। আমি মনে করি যাঁদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, যাঁরা চতুরার্য্য সত্য বুঝেছেন আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কার্য্য কারণনীতি অনুভব করেছেন, বুদ্ধের ধর্মের প্রতি যাঁদের যুক্তিমূলক বিশ্বাস জন্মেছে তাঁদের তো তন্ত্রবিদ্যার প্রতি এবং নানা রকম দেবদেবীর স্তুতি এবং শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানে রত থাকা এবং সরলমনা লোকদের এসব কাজে আকৃষ্ট করে রাখার কথা নয়। এক্ষেত্রে আমি বলব আমাদের বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের এবং আচরণের দুর্বলতাই দায়ী। বুদ্ধের আসনে দেবদেবীর মূর্তিরাখা এবং তাঁদের (তন্ত্রবিদ্যাধারী) ভাষায় তাঁদের তন্ত্রবিদ্যা আবিস্কারক গুরু দেবদের মূর্তি বা ফটো রাখা বুদ্ধের ধর্মের আচরণ নাকি তন্ত্র বিদ্যার বৌদ্ধদের নিজস্ব ধর্মের আচরণ। আমার নিজের মধ্যে এসব দেখে নানাবিধ প্রশ্ন জাগছে বুদ্ধের আমলে বুদ্ধ কি শিষ্যদের

মধ্যে এসব জটিল রোগের ঔষদ বিতরণ করেছেন কিনা? যদি না করে থাকেন, তাহলে আমি বলব, এটা সত্যিকার অর্থে বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান এবং আচরণের অভাব। এসব তন্ত্রবিদ্যার কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজেদেরকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত রেখে ভিক্ষু এবং গৃহীশিষ্য তৈরী করেছেন এবং তন্ত্রবিদ্যার মাধ্যমে রোগ ব্যাধি সারানোর ক্লিনিক পরিচালনা করছেন লাভ সৎকারের উদ্দেশ্যে। বুদ্ধ তার ধর্মে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত এ চারস্থরের মার্গ এবং ফল সহ আট স্তর এবং নির্বানসহ মোট নবম স্তরের উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রবিদ্যার গুরুদের ও নবম স্তর আছে এবং শিষ্যদের মধ্যে এ স্তরগুলোর প্রদান করেন। যে শিষ্য এ নয়টি স্তর লাভ করবেন এবং তিনি গৃহী হলেও গুরু হবেন এবং গুরুগিরি করতে পারবেন এবং এ স্তরগুলো তন্ত্রবিদ্যার গুরুকর্তৃক প্রদান করা হয়। এ স্তরগুলো বিনয়সম্মত এবং ত্রিপিটকের কোন পৃষ্ঠায় আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে বুদ্ধের ধর্মের যৎ সামান্য জ্ঞান মতে আমি তাঁদের (তন্ত্রবিদ্যাধারী) এ ধরণের আচরণকে বুদ্ধের ধর্মের নামে অপসংস্কৃতির চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থ উপার্জনের যদি চিন্তা চেতনা থাকে তাহলে ভিক্ষু না সেজে গৃহী হয়ে ও তো টাকা উপার্জন করা যায় এবং ভোগ বিলাস করা যায়, যা খুশী তা করা যায়। এসব ভিক্ষু বিনয়ের অবমাননা করে অকুশল সঞ্চয় নয় কি? বুদ্ধ পূজার নামে অর্থ সংগ্রহ করে অন্য কাজে ব্যয় করার কি যুক্তিকতা থাকতে পারে? বুদ্ধের ধর্মের নবম স্তর অতিক্রম করার জন্য বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করে ধ্যান সমাধির মাধ্যমে এ স্তরগুলো অতিক্রম করতে হয়। তজ্জন্য অপ্রমাদের সহিত জীবন যাপন করতে হয়। বুদ্ধের ধর্মানুসারে নূন্যতম পক্ষে স্রোতাপন্ন মার্গফল লাভ করলেও চারি অপায়ের দ্বার বন্ধ হয় এবং পরবর্তী সাত জন্মে নির্বাণ লাভ অবধারিত হয়। স্মৃতি ভাবনা ছাড়া এ স্তরগুলো লাভ করার কোন বিকল্প নেই। গুরুশীষ্যদের স্তরগুলো লাভ করতে হলে গুরুর নির্দেশিত পথে চললে এবং গুরুর মনকে খুশী করতে পারলে স্তরগুলো অর্জন করা যায়। তজ্জন্য বুদ্ধ নির্দেশিত শীল ভাবনার গুরুত্ব নেই। বরং রোগী দেখার কাজে তথাকথিত গুরুর ক্লিনিকের কাজের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। এসব চর্চায় দুঃখ মুক্তি নয় বরং অর্থ উপার্জন এবং নানাবিধ রোগ সারানোর নামে অনেক ক্ষেত্রে শঠতার পরিচয় বলে লোকমুখে শোনা যায়। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করার উদ্দ্যেশ্য শঠতা নহে, দুঃখ মুক্তি, জন্মরোধ করা, নির্বাণ মার্গে পতিত হওয়া এবং নির্বাণ লাভ করা এবং সে পথে বিচরণ করা। বুদ্ধ শঠতা,

প্রবঞ্চনা, কুসংস্কার বা অপ সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে দুঃখ মুক্তির অভ্রান্ত পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমাদের উচিত বুদ্ধের নির্দেশিত পথে নিজে আচরণ করে অন্যকেও সে পথে চলার উপদেশ দেয়া। তন্ত্রবিদ্যা বুদ্ধের ধর্ম নহে। শীল সমাধি প্রজ্ঞার আচরণ বুদ্ধের ধর্ম। আমি মনে করি ভগবান বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন সে আর্যসত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সঠিকভাবে অনুসরণ করে স্মৃতি ভাবনায় জীবন যাপন করে অন্যকেও সে পথে চলার উপদেশ দেয়াই তো মহৎ কাজ হবে। তজ্জন্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র পরিচালনা করা এবং জনসাধারণ যাতে সুবিধামত বিদর্শন ভাবনা করতে পারে সেজন্য সারাবৎসরব্যাপী বিদর্শন ভাবনা কোর্স করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং একাজে রত থাকা। আমি মনে করি বিশুদ্ধভাবে শীল পালন এবং বিদর্শন ভাবনার চর্চা করাই হচ্ছে দুঃখ মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা। তন্ত্রবিদ্যার সাথে সত্যিকার বুদ্ধের ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

আত্ম সমালোচনা না করা

আমরা বৌদ্ধ গৃহীরা অহরহ ভিক্ষু সংঘের সমালোচনা নানাবিধ আচরনের সমালোচনায় ব্যস্থ থাকি। যা মোটেই কাম্য হতে পারে না। অথচ নিজের সমালোচনা ভুলেও করি না। আত্ম সমালোচনা আত্ম শুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। ভিক্ষু সংঘ হচ্ছে স্বধর্মের ধারক ও বাহক। ভিক্ষু সংঘ আছে বলেই স্বধর্মের প্রচার এবং প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন অতীতে ভিক্ষু সংঘের অভাবে ভারত বর্ষে বুদ্ধ ধর্মের অপমৃত্যু ঘটেছে। আমাদের গৃহী বৌদ্ধদের উচিত ভিক্ষু সংঘকে নমস্য এবং পূজনীয় হিসেবে দর্শন করা এবং ভিক্ষু সংঘ যাতে বিনয় বিধি মেনে চলতে পারে সেভাবে সহযোগিতা করা। ভিক্ষু সংঘকে বিহার দান করে জল ঢেলে উৎসর্গ করে দেওয়ার পর সে বিহারের আধিপত্য নিয়ে গৃহীদের জড়িত থাকা মোটেই শোভনীয় নহে। বিহারের পুরোপুরি কর্তৃত্ব ভিক্ষু সংঘের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। বরং বিহারের উন্নতি কল্পে ভিক্ষু সংঘকে গৃহীরা সহায়তা করা উচিত। সমাজ সমিতি সংগঠন থাকবে সমাজে বিহারে নহে, এ কথা বৌদ্ধ গৃহীদের ভাবা উচিত। দান করা বিহার পুনঃ ভোগ দখল করা এবং ভিক্ষু সংঘের সহিত রুঢ় আচরণ করা বৌদ্ধ গৃহীদের যুক্তিসঙ্গত কিনা চিন্তা করা প্রয়োজন।

এতে অকুশল সঞ্চয় ছাড়া অন্য কিছু নহে। পঞ্চ আনন্তরীয় কর্মের মধ্যে সংঘভেদ একটি। এ ধরণের জঘন্য অপরাধ মূলক কর্মথেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকাই শ্রেয়। বিহারকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য, দলাদলি, হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং তা সামাজিকভাবে সমাধান না করে এবং ভিক্ষু সংঘের আদেশ নির্দেশ না মেনে কোর্ট কাচারীর আশ্রয় নিয়ে বিহারে ইনজেংশন জারী হয়ে একে অন্যের উপর ধরপাকড় এবং বিহার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী হলে সে বিহার ধ্বংস স্তুপে পরিণত এবং এতে সাধারণ নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে ধর্মীয় অনুভূতিতে বড় রকমের আঘাত লাগে এবং এজন্য শুরু হয় অহরহ একে অন্যের উপর দ্বেষ চিত্তের চর্চা। এতে শুধু বুদ্ধের ধর্মের অবমাননা নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে সংঘ ভেদের কারণে পঞ্চআনন্তরীয় কর্মের একটি কর্ম সৃষ্টি হয়। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা মুল্যায়ন করে নিজেরা দেখিনা।

আমরা বৌদ্ধরা অন্যের সমালোচনায় মুখর, নিজের সমালোচনা করিনা, আত্মশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য করি না। এটাই হচ্ছে বড় ভুল। বিশুদ্ধভাবে শীল পালন এবং প্রতি নিয়ত স্মৃতি সাধনায় রত থেকে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করাই ব্রত হওয়া উচিত।

গৃহীরা প্রায় সময় অভিযোগ করেন যে, ভিক্ষুদের টাকা পয়সা স্পর্শ করা শোভনীয় নহে। এটা বিনয় বিরোধী কাজ। এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য গৃহীদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘ যাতে বিনয় সম্মতভাবে জীবন যাপন করতে পারে সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৃহীদের নিতে হবে। যেহেতু এটা প্রতিরূপ দেশ নহে এবং ভিক্ষু সংঘের চলাফেরার জন্য সরকারীভাবে কোন ব্যবস্থা নেই। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ ও সংযমী ও ত্যাগী মনোভাব প্রদর্শন করতে পারেন এবং বৌদ্ধ প্রধান দেশ মায়ানমার এবং শ্রীলংকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ করতে পারেন।

বৌদ্ধদের মধ্যে কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা পরিলক্ষিত হয় যা মোটেই কাম্য নহে। যেমন স্বধর্মের ধারক ও বাহক পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে কিছু কিছু শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ভিক্ষু সংঘের সাথে রূঢ় আচরণ করে থাকেন যা নামমাত্র পঞ্চশীল ধারী গৃহী দুইশত সাতাশ শীল ধারী ভিক্ষু সংঘের সাথে আচরণ করা মোটেই শোভনীয় নহে। এসব আচরণ অনেক সময় সংঘভেদেরও কারণ হয়, যা কিনা পঞ্চ আনন্তরীয় কর্মের একটা কর্মে পর্য্যবশিত হয় এবং এর

পরিণাম ফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটা আমরা মোটেই আমলে নিই না। অথচ অতীব দুর্লভ মনুষ্য জন্মেকে সার্থককরার জন্য এমন আচরণ হওয়ার কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে দুর্লভ কি? কি অর্থে দুর্লভ এবং কেন দুর্লভ মানব জন্ম বলা হয়েছে তাও বুঝি না এবং বুঝারও চেষ্টা করি না। ত্রিপিটক শাস্ত্রের ভিক্ষু সংঘের মুখে শুনা একটা উপমা এখানে ব্যক্ত করা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করছি। যেমন একটা সাগরের তলদেশে নাকি একটা কচ্ছপ বাস করে। সে কচ্ছপ প্রতি একশত বৎসর পর পর সাগরে উপরে ভেসে উঠে এবং আবার তলদেশে চলে যায়। ঐ সাগরে একটা ছিদ্রযুক্ত কাঠ ভেসে চলে। কাঠটি বাতাসে এবং সাগরের তরঙ্গে এদিক সেদিক ভেসে যেতে থাকে। কচ্ছপ সাগরের তল থেকে যখন উঠে সোজা উপরের দিকে মাথা উঁচু করে উঠতে থাকে। কচ্ছপ নীচ থেকে উঠার সময় কাঠ তখন কোথায় থাকবে এর কোন ইয়ত্ত্বা নেই। তবুও বুদ্ধ বলেছেন প্রতি একশত বৎসর পর পর কচ্ছপ যখন সাগরের তলদেশ থেকে মাথা উঁচু করে সোজা উপরের দিকে পানির উপরিভাগে উঠে হয়তবা ঐ কাঠের ছিদ্র দিয়ে মাথা ঢুকতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু এ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে বৃথা হারালে আবার কখন মনুষ্য জন্ম পাওয়া যাবে সে আশা দুরাশা। মনুষ্য জন্ম পাওয়া গেলেও তখন হয়তবা স্বধর্মের বাণী থাকবে না কেউ স্বধর্মের কথাও বলবে না, এবং দুঃখ মুক্তির কোন কথা ও উচ্চারিত হবে না। সে ক্ষেত্রে মনুষ্য জন্ম লাভ করে কি হবে? মানব জন্মই একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে মানুষ দুঃখ ভোগ করে, দুঃখকে বুঝে এবং দুঃখ মুক্তির উপায় ও সে অবলম্বন করে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। অন্য কোন লোকে জন্ম ধারণ করলে এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব মানব জন্ম কেন দুর্লভ এটা আমাদের বুঝা উচিত যা আমরা গুরুত্ব দিই না।

বুদ্ধের ধর্ম মতে সম্যক জীবিকার জন্য পঞ্চ বাণিজ্য নিষেধ করা হয়েছে। যথা- প্রাণী, মাংস, অস্ত্র, বিষ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা। কিন্তু আমরা বৌদ্ধরা প্রাণী এবং মাংস ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছি এবং অনুরূপভাবে নেশাজাতীয় দ্রব্য তৈরী করে এবং বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছি এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে দুর্লভ জীবন অতিবাহিত করছি। প্রাণী হত্যা মহা পাপ এবং প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা বৌদ্ধদের পঞ্চশীলের প্রথম শীল হলেও তুলনামুলকভাবে বৌদ্ধরাই বেশী প্রাণী হত্যা করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং পঞ্চশীল লংঘন করে জীবন যাপন করে। তবে বর্তমানে বৌদ্ধদের শিক্ষা এবং নানাবিধ কলাকৌশল এবং শিল্প শাস্ত্র জ্ঞান অর্জনের

ফলে ধীর গতিতে হ্রাস পেলে ও তুলনামূলকভাবে পঞ্চ শীলের মধ্যে প্রথম এবং পঞ্চমশীল বেশী লংঘন হচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখলে এবং আন্তরিক হলে এর থেকে উত্তোরণ ঘটানো অসম্ভব নহে। দুঃখ মুক্তির জন্য শুধু পঞ্চশীল নহে বরং আর্যশীল আমাদের পালন করা উচিত। আর্য্যশীল বলতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মতে সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা মতে জীবন যাপন করা এবং আমি নিজে এগুলো পালন করছি কিনা তার আত্ম সমালোচনা করা, আত্ম কর্মের পর্য্যবেক্ষণ করা এবং পর চর্চা পিশুন বাক্যের মাধ্যমে অকুশল সঞ্চয় থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বুদ্ধ মূর্তি ও পূজার প্রভাব

বুদ্ধের ধর্মকে যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁরা হয়ত একমত হবেন যে, বুদ্ধের বাণী, আদর্শ ও দর্শনের মুল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যা দেখতে পাই তাতে বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ এবং পূজাকে মোটেই সমর্থন করে না। বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা উপদেশ হল 'চারি আর্য্যসত্য এবং প্রতিত্য সমুৎপাদন জ্ঞান। বুদ্ধের মহান বাণীর পরম আদর্শ হল আপন পর জীবন দুঃখের সামগ্রিক ও চির অবসানে কৃত সংকল্প হওয়া এবং সর্ব দুঃখহীন পরম শান্তি নির্বাণ ধর্মে অধিগত হওয়া। জীবন দুঃখের চির অবসানে, অপার শান্তি সুখময় নৈর্বাণিক অবস্থা অধিগমে কাল্পনিকতার কোন প্রয়োজন নেই। বরং একান্ত বাস্তব সম্মত অর্থপূর্ণ মনস্থাত্ত্বিক নিয়ম শৃঙ্খলায় যথাযথ অনুধাবন মননশীলতার অধিকারী হওয়া। বুদ্ধের বাণী ও দর্শনের মৌলিক জ্ঞান উপলব্ধিতে এবং দুঃখ মুক্তিতে বুদ্ধমূর্তি ও পূজার প্রয়োজন কতটুকু তা ভেবে দেখা যেতে পারে। অন্তিম শয্যায় শায়িত বুদ্ধ তথাগতকে সেবক আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভগবানের অবর্তমানে কে তাঁদের শাস্তা হবেন, আদেশ নির্দেশ, উপদেশ দাতা হবেন? তার উত্তরে বুদ্ধ ভগবান বলেছিলেন, হে আনন্দ! আমার উপদিষ্ট ধর্ম বিনয়ই হবে আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা, আদেশ উপদেশ কর্তা। আনন্দ মনে রাখবে সৎ উপদিষ্ট ধর্ম বিনয়ের চুরাশি হাজার ধর্ম স্কন্ধের প্রত্যেকটি এক একটি বুদ্ধ। বুদ্ধের বাণীকে যাঁরা যুক্তিমূলক বিশ্বাসে বিশ্বাস করেছেন এবং যাঁদের অন্তরে ন্যূনতম প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে তাঁদের হৃদয়ে কোন অবস্থাতে অন্ধ আবেগ প্রসূত মূর্তি পূজার জন্ম দিতে পারে না। তাই তথাগত বুদ্ধের মহা পরিনির্বাণের

পরবর্তী প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত কোন বুদ্ধমূর্তির অস্তিত্ব ছিল না এবং বুদ্ধের নামে কোন পূজার প্রচলন ও ছিল না। রাজা কনিস্কের সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতকে তাঁরই প্রেরণায় গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে সর্ব প্রথম বুদ্ধ মূর্তি তৈরী হয় পাকিস্তানের তৎকালীন গান্ধার রাজ্যে। গ্রীক প্রাচীন দেব দেবীর অনুকরণে বানাতে শুরু করল প্রথমে কাল্পনিক বুদ্ধ, পরে অসংখ্য কাল্পনিক দেব দেবীর মূর্তি। বুদ্ধের শিক্ষা মধ্যম পন্থা শ্রদ্ধা অর্থাৎ যুক্তিমূলক বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার স্থানই আছে বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পূর্ণ আবেগ নির্ভর অন্ধ ভক্তিতে নহে। শুরু হল ভক্তিবাদের একমাত্র আশ্রয় অলীক কল্পনা নির্ভর বুদ্ধ ও দেবদেবীর মূর্তি এবং পূজা অর্চনার স্তব স্তুতি মুলক শ্লোক রচনা, মানত, প্রার্থনা, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এতে প্রতিয়মান হয় যে, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব একান্তই গৌণ ও নির্বাণ অর্জন নয়, অহেতুক প্রার্থনা কামনার বিষয় মাত্র। নিরাকার অর্থাৎ মূর্তি ও মূর্তি পূজাহীন বুদ্ধের ধর্মে মূর্ত্তি, মূর্ত্তি পূজার প্রবর্তন, বুদ্ধের প্রকৃত বাণী ও আদর্শ থেকে মহাবিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নহে। নিরাকার সাধনা ভাবনার মাধ্যমে সুক্ষ্ম মেধা শক্তি বিকাশের ফসল হচ্ছে প্রজ্ঞা আর সাকারের স্থূল, মেধা বুদ্ধির সহজ বোধ্য বিষয় হলো এ মূর্তি। সাধনা ভাবনা বাদ দিয়ে মূর্তি ও মূর্তি পূজার গ্রহণযোগ্যতা হুহু করে বেড়ে চলেছে এবং দিনদিন নানাবিধ পূজা ঢুকে পড়ছে, ঠেকানোর সাধ্যকার। আমাদের মনে রাখা দরকার অন্ধভক্তিবাদের প্রবণতা মুক্তিপথের সহায়ক না হয়ে কখনও কখনও বিপরীত ধর্মী হয়। চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম দানে অসম্ভব পটু এ অন্ধভক্তিবাদ। বুদ্ধ মূর্তিকে নিয়ে অনেক হাস্যকর কাজও পরিলক্ষিত হয়। যেমন বুড়া গোসাই, পাগলা বুদ্ধ, বড় বুদ্ধ, রাম কোট বুদ্ধ, চিৎমরম বুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধানে ভূষিত করে থাকেন একমাত্র গৌতম বুদ্ধের মূর্তিকে। আবার এক এক বুদ্ধ মূর্তির এক এক গুণ আছে বলে ও প্রচার করেন এবং তাঁদেরকে পূজা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে কোন আশা-আকাঙ্খা মানত পোষণ করলে তা পূরণ হয়। এ ধরণের বিশ্বাসের অনুসারী গৃহী বা ভিক্ষু শ্রামণের অভাব নেই।

বৌদ্ধরা লাভ সৎকারের জন্য মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে সিবলী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, শনি পূজা, স্বরস্বতী পূজা, কার্ত্তিক পূজা এবং আরো নানাবিধ পূজা করে। সিবলী লাভী শ্রেষ্ঠ হয়েছে লোভ চিত্ত সংবরণ করে একান্ত প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে। অতীতে একজন বুদ্ধকে মধু চাক দান করার ফলে এ জন্মে লাভী শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, সীবলী অরহত হয়েছেন, সীবলী পূজা করলে সীবলী কি

বর দেবে ধনী হওয়ার জন্য? পরিশ্রম না করলে বা কর্ম না করলে লক্ষ্মী কি ঘর ভরে দেবে? কর্ম পরিশুদ্ধ না করলে শনি কি রক্ষা করবে? লেখা পড়া না করে স্বরস্বতী পূজায় কি পরীক্ষা পাশ হয়ে যাবে? খৃষ্টান বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পূজা করছেনা বলে তারা কি ধনী বা জ্ঞান অর্জন করতে পাচ্ছে না। যাবতীয় পূজা না করার জন্যতারা কি সার্বিকভাবে অনগ্রসর রয়ে গেছেন। এ সব পূজার মিথ্যা দৃষ্টি এক শ্রেণীর লোক নিজেদের লাভ সৎকার তথা স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রচলন করেছেন এবং আজও করছেন। সারিপুত্র ধর্ম সেনাপতি, মৌদগল্যায়ন ঋদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আনন্দ মহা শ্রুতিধর কিন্তু উনাদের পুজা করেন না।

কারণ উনাদের সাথে লৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন লাভ সৎকারের প্রয়োজন মনে করছেন না। লোকোত্তর চিন্তা চেতনা জাগ্রত করার কোন চর্চা করা হচ্ছে না। ভোগে মহা দুঃখ, ভোগের চিন্তাতেই কেবল নিমর্জিত রয়েছি আমরা। লোকোত্তর চিন্তা চেতনার চর্চা করা হচ্ছে না।

গৌতম বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং সনাতন ধর্ম অনুসারে শাস্ত্র শিক্ষা করেছেন। পরবর্তীতে সন্যাস জীবন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ পন্ডিতদের কাছে শাস্ত্র শিক্ষা এবং উচ্চ মার্গের যোগ সাধনা করেছেন। পূজা অর্চনা কৃচ্ছসাধন কিছু বাদ দেননি। কিন্তু দুঃখ মুক্তি বা পুনঃ জন্ম রোধে চরম মুক্তির পথের সন্ধান না পেয়ে অবশেষে নিজেই নিজের সাধনার পথে আত্ম নিয়োগ করলেন এবং শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে স্বচেষ্টায় মুক্তি পথের নতুন সন্ধান পেয়েছেন। পূজা অর্চনার অসারতা এবং অনেক ক্ষেত্রে পূজা অর্চনার মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টিকে পোষণ করার মানসিকতা বুদ্ধ চরমভাবে উপলব্ধি করেছেন। এক শ্রেণীর লোক লাভ সৎকারের উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনাকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের (পূজারীদের) হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সরল মনা লোকদের মুক্তির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূজা জজ্ঞের নামে অজশ্র পশু হত্যা করেছে এসব পূজারীরা এমনকি নরহত্যাও বাদ পড়েনি ধর্মান্ধ পূজারীদের হাতে। তাঁর (বুদ্ধ) ধর্মে পূজা অর্চনার প্রয়োজন নেই। দেহ মনের সাধনাই যথেষ্ট। পূজা দুই প্রকার যথা– ১। আমীষ পূজা ও ২। নিরামিষ পূজা। বিভিন্ন ফল ফুল খাদ্য বস্তু দিয়ে যে পূজা করা হয় তা হচ্ছে আমীষ পূজা আর দেহমনের সাধনা করাকেই নিরামিষ পূজা বলা হয়। বুদ্ধ এ নিরামিষ পূজারই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বৌদ্ধরা কালক্রমে বুদ্ধের নীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে আমীষ পূজার উপর বেশী ঝুঁকে পড়েছি। শনি পূজা, কার্ত্তিক পূজা,

স্বরস্বতী পূজা, মারখোলায় পূজা, সেবা খোলায় সেবা দেয়া, আশ্বিনে ভাত রেঁধে কার্ত্তিকে খাওয়া এবং পূজা করা এবং আরো অনেক দেবদেবীর পূজা সনাতন ধর্মের অনুসারীদের থেকে দেখে দেখে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলন ছিল। ইদানিং ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষায় জ্ঞানের উন্নতি ফলে পুরাতন পূজার কিছুটা প্রচলন কমলেও নূতন নূতন পূজার আবির্ভাব হয়েছে। যেমন- সীবলী পূজা, আটাশ বুদ্ধের পূজা, রাত্রি বারোটা বাজে অরহত পূজা এবং ইদানিং কালের গুরু শিষ্যদের বুদ্ধের আসনে স্বরস্বতী এবং তন্ত্রবিদ্যার গুরুদের গুরু পূজাসহ নব নব পূজার আয়োজন করা হচ্ছে। পূজা অর্চনার ধর্ম শ্রমন গৌতম ত্যাগ করে স্বীয় পারমী বলে বুদ্ধ হয়েছেন গৌতম বুদ্ধ নাম ধারণ করেছেন। পূজা বুদ্ধের ধর্ম নহে, সনাতন ধর্মাবলম্বনকারীদের ধর্ম হচ্ছে পূজার ধর্ম। অথচ আমরা বৌদ্ধরা বুদ্ধের ধর্ম বাদ দিয়ে পূজার ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। পূজা অত্যন্ত নিম্নমানের কুশল চর্চা এবং এর মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বেড়িয়ে আসা কঠিন। নিরামিষ পূজা অর্থাৎ দেহ মনের সাধনা বা আধ্যাত্মিক পূজা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পূজা এবং এ দেহ মনের চর্চার মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয়, ত্রিলক্ষণ জ্ঞান জন্মে, সম্যক দৃষ্টি সম্পর্কে উপলব্ধি আসে এবং মুক্তি মার্গে চলার পথ সুগম হয়। বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে নিরামীষ পূজার কথাই বলেছেন। তজ্জন্য আমিষ পূজা নয়, নিরামিষ পূজা, সাকারের চর্চা নয়, নিরাকারের চর্চাই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধদের মধ্যে পুরোহিত প্রথা বিদ্যমান। পুরোহিত বলতে আমি পূজা অর্চনা এবং দানাদি কার্য্য সম্পাদন অনুষ্ঠানে একটা থালায় ১/২ কেজি চাউল রেখে চালের উপর ১টা নারিকেল এক কান্দি কলা এবং আরো অন্যান্য সামগ্রী সহ উপকরণকে বুঝায়। আমার ধারণা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচলন থেকে এবং যুগে যুগে বুদ্ধের ধর্মের ধ্বংস সাধনের পর বুদ্ধের ধর্মে এ পুরোহিত প্রথা যুগযুগান্ত র চলে আসছে। ভিক্ষুদের পুরোহিতের কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু ভিক্ষুদের বিনয়ে খাদ্য বস্তু এবং সামান্য লবণও মজুদ করে রাখার কোন বিধান নেই। আমরা গৃহীরা বরং পুরোহিত দিয়ে ভিক্ষু সংঘকে বিনয়ের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি। খাদ্য বস্তু মজুদ রাখার প্রয়োজন হলে কপ্পিয় ভান্ডারে স্থানান্তর এবং সংরক্ষণ করে ভিক্ষুদের প্রয়োজনে পরে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ বুদ্ধের ধর্মে এ পুরোহিতের প্রথা ছিল কিনা এবং ত্রিপিটক শাস্ত্রে আছে কিনা আমার জানা নেই। বৌদ্ধরা মাতা পিতা প্রিয় পরিজন মারা গেলে সাপ্তাহিক ক্রিয়া কর্মে ভিক্ষু সংঘের অনুষ্ঠান শেষ করার পর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মোছাভাত তোলেন এবং এ মোছা ভাতে তিনি (মৃত ব্যক্তি) যা যা খেতে ভালবাসতেন বা তাঁর

(মৃত ব্যক্তির) মনে যে তৃষ্ণা ছিল সে সব খাদ্য বেশী দেন যেমন বড় মাছের মাথা, মাছের বড় টুকরা, মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি এবং সাথে পান সুপারী, তামাক ইত্যাদিও দেন। এ মোছাভাতে যদি কোন কাক বা পক্ষী জাতীয় প্রাণী উড়ে এসে খায় তাহলে যাঁরা মোছাভাত তোলেন তাঁরা খুশী হন এ মর্মে যে, মৃত ব্যক্তিটি পাখীর রূপ ধরে খেতে এসেছেন। এ মোছাভাত প্রথা বুদ্ধের ধর্মের বিষয় বস্তু কিনা এবং এর যথার্থতা আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। অথচ আমরা বৌদ্ধরা তা করে যাচ্ছি। তিরোকুন্ড সূত্রে উল্লেখ আছে যে, কালগত জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে সংঘে দান করলে সে দান জনিত পুণ্য কালগত জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে দান করলে সে দান জনিত পুণ্যের প্রভাবে কালগত জ্ঞাতীগণ ভোগ সম্পদ লাভ করে তৃপ্ত হন। এক্ষেত্রে মোছাভাতের কি কাজ হয় তা ভেবে দেখা দরকার। এ যাবত বুদ্ধের ধর্ম এবং বৌদ্ধ আচরিত ধর্ম সম্পর্কে কিছু তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা হল। এগুলো উপর চিন্তাভাবনা করে দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করার জন্য বুদ্ধের ধর্ম আচরণ নাকি বৌদ্ধদের কর্তৃক আচরিত ধর্ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেটি প্রযোজ্য সেটিইতো আচরণ করা উচিত।

নেত্রীত্ব এবং জ্ঞান চর্চা

বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষত: বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে নেতা হওয়ার প্রবণতা খুব বেশী। প্রত্যেকে নেতা হতে চায়। ধর্মীয় অনুষ্টানাদিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনার চেয়ে এসব বৌদ্ধ নেতাদের পরিচিতি এবং বক্তৃতারই প্রাধান্য বেশী বেশী থাকে। বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হলে ও নেতাদের বক্তব্য দিতে হবে। ফলে ধর্ম সভার ধর্মদেশনা এবং ধর্ম শ্রবণে চরম ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কোন কোন নেতা যদি বক্তব্য দেয়ার সুযোগ না পায় তাহলে তো কোন কোন সময় মহাকাণ্ড ঘটে যায়। শুরু হয় অনৈক্য, দলাদলি এবং হিংসা বিদ্বেষের চর্চা। বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি দেখলে আমার মনে হয় ধর্ম সভাতো নহে বরং বক্তৃতা ট্রেনিং সেন্টার বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। বৌদ্ধদের মধ্যে নব বিদ মানের চর্চা খুব বেশী। সে নববিদ মান হচ্ছে ১। শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, ২। শ্রেষ্ঠের সমকক্ষ, ৩। শ্রেষ্ঠ থেকে হীন। ৪। উত্তমের উত্তম, ৫। উত্তমের সমকক্ষ, ৬। উত্তম থেকে আংশিক হীন, ৭। অধমের উত্তম, ৮। অধমের সমকক্ষ এবং ৯। অধমের অধম।

এমানগুলো যে মহৎ জীবন গঠনে কতটুকু ক্ষতিকর তা আমরা বুঝার চেষ্টা করি না। দশ সংযোজনের একটি হচ্ছে মান। এ মান দুঃখ মুক্তির উচ্চতম স্ত র লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সংযোজন হচ্ছে যা সত্বগণকে মুক্তিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষত বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা এবং জ্ঞান মেধার কমতি নেই। শুধু মাত্র একতা সাম্য মৈত্রীতার অভাবে বড়ুয়া বৌদ্ধরা কিছু করতে পাচ্ছে না। তা না হলে বড়ুয়া বৌদ্ধরা এদেশে অনেক অগ্রসর হতে পারত এবং দেশে বিদেশে অনেক অবদান ও রাখতে পারত। বৌদ্ধদের সার্বিক উন্নতি আজ একতার প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় বই ক্রয় করা, ধর্মীয় বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করা গবেষণা করার মানসিকতা নেই বললেই চলে। কোন উৎস থেকে দান স্বরূপ ধর্মীয় বই পেলে ও বইয়ের পৃষ্ঠা নাড়াচাড়া করে দেখার সময় নেই। শো কেজে রাখাটাই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করে আবারো বিনয়ের সাথে বলছি, মনুষ্য জন্ম লাভ করা বড় দুর্লভ। দুর্লভ স্বধর্ম শ্রবণ। দুর্লভ স্বধর্ম চর্চার পরিবেশ। দুর্লভ মনুষ্য জন্মের মূল্য এবং মূল্যায়ন করা উচিত। বুদ্ধের বাণী এবং বৌদ্ধদের আচরণের পার্থক্য চিহ্নিত করে সত্যিকার বুদ্ধের ধর্ম অনুসরণ করা উচিত।

বিদর্শন ভাবনার পার্থক্যতা

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদর্শন ভাবনার পুনঃ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এটা স্বধর্মের প্রচার এবং প্রসার লাভের জন্য একটা শুভ লক্ষণ। এ ব্যাপারে সম্প্রতিকালে প্রয়াত বিদর্শনাচার্য বোধিপাল শ্রমণ এবং তাঁরই শিষ্যা বিদর্শনাচার্য্য প্রয়াতঃ রানু প্রভা বড়ুয়ার যে যথেষ্ট অবদান রয়েছে তা দৃঢ় চিত্তে বলা যায়। আচার্য বোধিপাল শ্রামণের বিদর্শন ভাবনা পদ্ধতি মায়ানমারের মাহাসী সেয়াড এর পদ্ধতি অনুসারে বিদর্শন ভাবনা পদ্ধতি অনুশীলিত হতো। কিন্তু কালক্রমে তা কিছুটা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। নিরব সরব নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা হচ্ছে। তবে বিদর্শন ভাবনা গুরুদের ব্যক্তিগত মতামতের উপর কারো হাত নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে ইদানিংকালে অনেক বিদর্শন আচার্যের আবির্ভাব হয়েছে। প্রত্যেকে যাঁর যাঁর জ্ঞানানুসারে বিদর্শন ভাবনা পরিচালনা করছেন। তথাগত বুদ্ধ তাঁর (বুদ্ধের) নবাবিস্কৃত ধর্মে মহা সাতিপট্ঠান সূত্রে

ভাবনা পদ্ধতি ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু এদেশের বিদর্শনাচার্যগণ তাঁদের স্ব স্ব পদ্ধতি মতে বিদর্শন ভাবনা পরিচালনা করছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এদেশের বিদর্শন আচার্য্য গণের মধ্যে একে অন্যের সাথে সহমর্মিতা ভাব নেই বললেই চলে। এমন কি দুইজন আচার্য্য পাশাপাশি বসতেও রাজী নন, আলাপ তো দূরের কথা। একে অন্যের সমালোচনায় মুখরিত। পিশুন বাক্য কাকেবলে উনারা জেনেও উপেক্ষা করেন। কিছু কিছু আচার্য্যগণের চালচলন এবং হাবভাব আমার কাছে আশ্চর্য্যই মনে হয়। আমার মতামত হচ্ছে বিদর্শনাচার্যগণ স্বধর্ম প্রচারে উচ্চ স্তরের কল্যাণ মিত্র। এসব কল্যাণমিত্রগণের মধ্যে আন্তরিকতা সহমর্মিতা এবং সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকা উচিত এবং সবাই এক জায়গায় বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তথাগত বুদ্ধের সত্যিকার বিদর্শন ভাবনা নীতি প্রচার করা উচিত। বুদ্ধের ভাবনা পদ্ধতি এক প্রকার এতে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার কোন অবকাশ নেই। সম্প্রতি বিদর্শন আচার্য্য গণের স্বভাব চরিত্র নিয়েও নানাবিধ গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে সত্য একদিন প্রকাশ হবেই। সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে গোপন করার সাধ্য কারো নেই। আচার্য্যগণের স্বভাব চরিত্রের দুর্বলতা থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মুক্তিকামী মানুষের বিদর্শন ভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে এবং ভাবনা বিমুখ হবে। পূত পবিত্র দেহ মনই বিদর্শন ভাবনা চর্চার প্রথম সোপান। সেজন্য বিদর্শন আচার্য্যগণের স্বভাব চরিত্র আচরণ শোভনীয় হওয়া উচিত এবং বিদর্শনের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিপক্ষতা থাকা উচিত। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর। শুধু গুরু সেজে লাভ নেই। আত্ম হিত এবং পরের হিতের জন্য ধ্যানে এবং জ্ঞানে প্রথমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। প্রত্যেকের স্ব স্ব নব বিদ মান পরিত্যাগ করে বিদর্শন ভাবনাকে একধারায় প্রচার করা উচিত এবং একে অন্যের সমালোচনা না করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা উচিত। তা না হলে বিদর্শনাচার্য্যদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা পদ্ধতি এবং তন্ত্রবিদ্যার আচার্যদের গুরুশিষ্যের ভাবনার যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হচ্ছে তাতে বুদ্ধের সত্যিকার ভাবনা পদ্ধতি লোপ পেয়ে নব নব অপসংস্কৃতির ভাবনা পদ্ধতির প্রসার ঘটবে এবং বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের পরিবর্তে তন্ত্রবিদ্যার ক্লিনিকের উদ্ভব হবে। আমাদের উদ্দেশ্য যেন তন্ত্রবিদ্যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন না করে সত্যিকার বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে কর্মস্রোত বা কর্ম প্রবাহে যে অকুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়েছে তা ক্ষয় করা, ধ্বংস করা, এবং অকার্যকর করা এবং নূতনভাবে যাতে

আর অকুশল সংস্কার উৎপন্ন না হয় সেজন্য সদা সর্বদা সচেতন সজাগ থাকা। অবিদ্যা দূরীভূত করে বিদ্যা উৎপন্ন করা অর্থাৎ অজানা থেকে জানা এবং অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের চর্চা করা। জানা অর্থে এখানে দেহ মনে যখন যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাকে জানা বুঝানো হচ্ছে। সাথে সাথে জানলে এবং গভীরভাবে জানলে সে বিষয় মনেমনে স্মরন বা জপ করলে পরবর্তীতে সংস্কার উৎপন্ন হবে না। বর্তমানে স্বরব এবং নীরব ধ্যান এ দুই প্রথা বিদ্যমান। এ দুই প্রথা বিপরীত ধর্মী এবং এতে যথেষ্ট সমালোচনা ও চলছে। নীরব ধ্যান করা ভাল নাকি উচ্চশব্দ করে ধ্যান করা ভাল এ নিয়ে বসে গবেষণা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন এবং এ দুই প্রথার একটা বিলোপ হওয়া প্রয়োজন।

ভিক্ষু সংঘের প্রতি নিবেদন

পরম পূজ্যস্পদ স্বধর্মের ধারক ও বাহক পূজনীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ সম্পর্কে কিছু বলা আমার মত নগন্য নরাধম নামমাত্র পঞ্চশীল ধারীর মোটেই শোভনীয় নহে। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রেখে সমকালীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পুজনীয় ভিক্ষু সংঘের পরস্পর বিপরীত ধর্মীয় কিছু উক্তির সূত্রধরে বলতে চাই যে, ইদানিং কঠিন চীবর দানাদি কার্য কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য হলে সম্পাদিত হচ্ছে এবং এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনাও শুরু হয়েছে। গত ১৫ই নভেম্বর ২০০২ ইং তারিখ চট্টগ্রামস্থ মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে "দি ওয়ার্ল্ড বুদ্ধ সাসন সেবক সংঘের" উদ্যোগে কঠিন চীবন দানানুষ্ঠানে উক্ত সমালোচনার জবাবে পরম শ্রদ্ধেয় জনৈক ভিক্ষু রুঢ় ভাবে বলেন যে, যেসব ভিক্ষু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এটা কি বিনয়ে আছে? শিক্ষকতা করা মানে চাকুরী করা অর্থাৎ তাঁরা (ভিক্ষু) চাকর। ভিক্ষু কি চাকর হতে পারে? একথা আমার নিজের কানে শুনা এবং হল ভর্তি শ্রোতারা সবাই তা শুনেছেন। আমরা বৌদ্ধ গৃহীদের নমস্য এবং পূজনীয় হচ্ছেন ভিক্ষু সংঘ। ভিক্ষু সংঘ চাকর হউক এটা কিছুতেই আমাদের কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া বাংলাদেশ প্রতিরূপ দেশ নহে। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মর্যাদা একজন অবৌদ্ধ কিছুতেই বোঝার চেষ্টা করেন না। ফলে যিনি শিক্ষকতা করেন উনাকে অবশ্যই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে লৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে আচরণ করা ছাড়া হয়ত উপায় থাকেনা। চাকুরী করলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্য চাকুরীর নিয়মকানুন

অনুসারে মেনে চলতে হবে এবং সেভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এটা লোকোত্তর দৃষ্টিতে এবং বিনয় সম্মতভাবে মোটেই শোভনীয় নহে। প্রয়াতঃ শ্রদ্ধেয় কৃপাশরণ মহাস্থবির তৎকালীন ভারত বর্ষের ইংরেজ লাট সাহেবকে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেননি। শুধুমাত্র আশীর্বাদ করেছেন এবং আসনে বসে ছিলেন। চাকুরী করলে এসব নিয়ম এদেশে পালন করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখা উচিত। ডঃ বড়সম্বোধি থেরো তাঁর "উপসম্পদা বিধি ও ভামুকলোম বিনিচ্ছয়" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন উপসম্পদা গ্রহণ কালে আচার্য্য উপাধ্যায় বলে থাকেন আপনি সরকারী চাকুরী করেন কি? তখন যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন তিনি বলেন, না ভন্তে। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় ভন্তের কথা সত্য যেহেতু তিনি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন উপসম্পদা লাভের পরে।

অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিক্ষু সংঘের শিক্ষকতা করার প্রয়োজন ছিল। কারণ তখন গৃহীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ছিল না। বর্তমানে গৃহীদের মধ্যে যেহেতু ত্রিপিটক বিশারদ রয়েছেন সেক্ষেত্রে গৃহীরা ধর্মীয় শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হলে গৃহীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের বিনয় রক্ষা করার পথ ও সুগম হবে। শ্রদ্ধেয় প্রয়াতঃ ধর্মবংশ মহাস্থবির মহোদয় একসময় চট্টগ্রাম কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার অর্থাৎ পালি বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। যখন শ্রদ্ধেয় ভন্তের ছাত্র প্রয়াতঃ মহিম বাবু পালিতে এম,এ, ডিগ্রী নিয়েছেন তখন শ্রদ্ধেয় ধর্মবংশ মহাস্থবির মহোদয় শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়েছেন এই বলে যে আমার আর শিক্ষকতা করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমার ছাত্র তৈরী হয়েছে শিক্ষকতার জন্য। তখন শ্রদ্ধেয় ভন্তের স্থলে মহিম বাবুকে শিক্ষকতায় নিয়োগ করে শ্রদ্ধেয় ভন্তে শিক্ষকতা থেকে বিরত থাকেন। এসব দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হতে পারে। ত্রিপিটকের জ্ঞান অর্জন, পালি সাহিত্য চর্চা, গবেষণা, অধ্যায়ন অধ্যাপনার জন্য বিনয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৌদ্ধদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেখানে বিনয় রক্ষা করে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ত্রিপিটক শিক্ষা দিতে পারবেন এবং ত্রিপিটকের শিক্ষা চর্চা, গবেষণার পথ সুগম হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষারও প্রসার ঘটবে। বৌদ্ধদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেন্দ্রিয়ভাবে একটা পালি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা মোটেই অসম্ভব নহে। তজ্জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহণ করা যা পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং উক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ শিক্ষকতা, পালি শাস্ত্র তথা ত্রিপিটকের

গবেষণা করা পথ সুগম হবে এবং বিনয়সম্মতভাবে জীবন যাপনও করা যাবে। ভিক্ষু সংঘের যাতে বিনয় রক্ষা হয় সে জন্য গৃহীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন কাজে কর্মে ভিক্ষু সংঘকে সহযোগিতা করতে হবে। মহৎ উদ্দেশ্যে থাকলে ভিক্ষু সংঘের প্রাপ্ত দানীয় সম্পদের মাধ্যমেও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব নহে। মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শয্যাগত বুদ্ধের সহিত আনন্দ বলেছিলেন ভদন্ত মাতৃ জাতির প্রতি আমাদের কি রকম হওয়া বাঞ্চনীয়? বুদ্ধ বলেছেন অদর্শন। তখন আনন্দ স্থবির বললেন, ভন্তে যদি দর্শন? যদি দর্শনের প্রয়োজন হয় তাহলে কি হবে? বুদ্ধ বললেন আলাপ করবে না। স্তৃতি জাগ্রত রাখবে। অথচ শিক্ষকতার মাধ্যমে নারী জাতীর সহিত দর্শন এবং আলাপ উভয় কার্য সংঘটিত হচ্ছে। বুদ্ধের অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়ন কে করে?

তথাগত বুদ্ধ বহুজনের হিতের জন্য সুখের জন্য দেশে দেশে স্থানে স্থানে বিরচন করে ধর্মের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আমরা বৌদ্ধরা যে যেখানে আছি শক্ত ভীত রচনা করে সেখানে বসে আছি। বহু জনের সুখ তো দূরের কথা নিজের সুখের কথাও ভাবছিনা। মৃত্যুর পর কোথায় যাব সে চিন্তা যেন ভুলে গেছি। আমার চিন্তা চেতনা কেবল ভাল ভাল খানা খাওয়া, ভাল কাপড় পড়া, দামি দামি প্রসাধনী ব্যবহার করা, ভালভাবে থাকা আর টাকা পয়সা সঞ্চয় করা। মন অহরহ কেবল পেতে চায় আরো চাই, আরো চাই– এ চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। যত পাই ততই চাই। ভোগে মোটেই তৃষ্ণা মিঠে না। তৃষ্ণা যেন আমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। বুদ্ধের বাণী তৃষ্ণাই সর্ব দুঃখের মূল। এ বাক্য আজ ত্রিপিটকের পাতায়। আমার মত মানুষের অন্তরে নেই। তা না হলে তৃষ্ণা আমাকে এভাবে গ্রাস করত না।

অনুষ্ঠান করি, আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করি কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন রক্ষা করি না, পালন করি না। দান শীল ভাবনা, বা শীল সমাধি প্রজ্ঞার মধ্যে কেবল দানেরই অগ্রাধিকার বিবেচনা করি। কারণ দান দিলে ভোগকরা যাবে। কেবল অহরহ ভোগের কামনা এবং ভোগে লিপ্ত থাকা স্বভাব। বুদ্ধের বাণী বহুজনের হিতের জন্য সুখের জন্য পূজনীয় ভিক্ষু সংঘদের মধ্যে শহরমুখী বিহারে বসবাস করার প্রবণতা হ্রাস করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিহার আছে অথচ ভিক্ষু নেই সেখানে গিয়ে অবস্থান করলে স্বধর্মের উন্নতি হবে নিজের হিত এবং অন্যের হিত সাধনেও যথেষ্ট সহায়ক হবে। পার্বত্য অঞ্চলের অনেক জায়গায়

বিহার এবং ভিক্ষুর অভাবে এবং ভিক্ষুদের স্বধর্মের তৎপরতার অভাবে বান্দরবানের বহু উপজাতি বম, খিয়াং, মুরুং সহ অনেক উপজাতি স্বধর্মের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ স্বধর্মের প্রচারে তৎপর হলে এবং বিহার থেকে মাঝে মধ্যে বেড়িয়ে লোকালয়ে ধর্মাচরণ করলে বান্দরবানের এ ধর্মান্তরিত কাজ হতো না। বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গে বিশেষতঃ বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর জেলায় এখনও প্রচুর বৌদ্ধ নামধারী লোক রয়েছেন্। ইতিমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় তারা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সে সব এলাকায় ভিক্ষু সংঘ অবস্থান করে স্বধর্ম প্রচার করলে প্রচুর জনগোষ্ঠী স্বধর্মের আলো পেয়ে মনুষ্য জন্মকে সার্থক করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইদানিংকালে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বুদ্ধ মূর্তি চুরি হলে বা বিহারের চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুদেরকে জড়িতকরেন এবং থানায় মামলা করার মাধ্যমে ভিক্ষু সংঘ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দারুনভাবে নাজেহাল হচ্ছেন। এজন্য ভিক্ষুসংঘ পরস্পরকে দোষারূপ এবং মিথ্যাচার শুরু করেন। পুত পবিত্র ভিক্ষুসংঘের এ ধরণের আচরণ কোনসুচী ধার্মিক দায়ক কখনও আশা করেন না, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে। ভিক্ষুসংঘ মামলা মোকর্দ্দমায় লিপ্ত হওয়া মোটেই শোভনীয় নহে। বিহার তথা সংঘারাম কাড়াকাড়ি মামলা মোকর্দ্দমার মাধ্যমে একজন সংঘ সদস্য আরেকজন সংঘ সদস্যকে উচ্ছেদ করেন ঐ মন্দির ভোগ দখল করার জন্য। যদি দখল করতে না পারেন তাহলে অন্য নিকায়ে যোগদান করে পার্শ্বে আরেকটি মন্দির তৈরী করে দায়কদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে ভোগবাসনায় লিপ্ত থাকেন এবং তারপর চলতে থাকে পর চর্চা এবং দ্বেষ চিন্তা চেতনা। অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে নানাবিধ কুৎসা রচনা করে দায়ক দায়িকাদের মনে বিরূপ ধারণা দিয়ে তাঁদের মধ্যে নিজের আখের গোছানোর নগ্ন পায়তারা ও পরিলক্ষিত হয়।

সংসার ত্যাগী ভিক্ষু সংঘ, বিশেষত যাঁরা একটু ধ্যান ভাবনায় লিপ্ত থাকার ভান করেন তাঁদেরকে নব বিধ মানে জর্জরিত থেকে অহং এর চুড়ান্ত সীমায় অবস্থান করেন। কোন কিছু লাভ না করা সত্ত্বেও স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ অভিদায় নিজেকে অভিহিত করার ঘৃণ্য তৎপরতা ও কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য দায়কের মধ্যেও এ প্রবণতা বিদ্যমান। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত ব্যবসায় ভিক্ষু সংঘের সাথে কিছু কিছু শিক্ষিত শট দায়ক-দায়িকা কাল্পনিক ঘটনা বর্ণনা

পূর্বক ঐ ভিক্ষুর তোষামোদকারী হিসেবে কাজ করেন। এ সবের উদ্দেশ্য মিথ্যা যশ ক্ষ্যাতি এবং অর্থ উপার্জন। বিনয়মতে ভিক্ষু সংঘ চতুচক্রযান, ত্রিচক্রযান বা অন্য কোন যান চালাতে পারেন কিনা? কোন কেউ অলৌকিক কথা বললে আমরা তাঁকে সিদ্ধপুরুষ, অরহৎ, শ্রাবক বুদ্ধ, অনুবুদ্ধ ইত্যাদি অভিধায় প্রচার করি। আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও অলৌকিক কথা বলতে পারেন, তাই বলে তারা অরহত নন এবং মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত নয়। বুদ্ধ বলেছেন যেখানে চতুরার্য সত্য নেই তা ধর্ম হতে পারে না। দুঃখ মুক্তির সঠিক পথ হতে পারেনা। শমথ ভাবনাকারীরা অনেক ঋদ্ধি অর্জন করতে পারেন, তার অর্থ এ নয় যে উনি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এসব ঋদ্ধির চ্যুতি আছে। বিদর্শন ভাবনাকারী মার্গফললাভীদের চ্যুতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এসব আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে। স্বঘোষিত মার্গফল লাভীদের কথা এবং আচরণে আকাশ পাতাল তফাৎ। ইদানিংকালে দেখা যায় সত্যিকার বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নেই সে সব দায়কেরা কোন কোন ভিক্ষুকে ষড়াবিজ্ঞ অরহত বলেও প্রচার করছেন এবং আরো বলছেন একমাত্র উনিই ষড়াবিজ্ঞ অরহত বর্তমানে বিদ্যমান। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে কে কাকে কতটুকু বুঝতে পেরেছেন। কার বুঝার ক্ষমতা কতটুকু আছে। এসব মিথ্যাচার করে অকুশল সঞ্চয় করার কি কোন ফল নেই। এসব মিথ্যাচারের পরিনতি কি তাও জানা দরকার নতুবা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত বৃথা হবে। ইদানিংকালে বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে স্বধর্মের ধারক ও বাহক পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের গুরু শিষ্যদের আচরণাদিতে। গুরু আচার্যগণ উপসম্পদা দিয়ে শিষ্য তৈরী করেন কিন্তু বুদ্ধ নির্দেশিত পথে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত শিষ্য তৈরী করেন না। বিনয়সম্মত জীবনযাপন এবং ভাবনা শিক্ষা দেন না বললে অতিরঞ্জিত হবেনা। অবশ্য গুরুগণ ও এসব বিষয়ে সচেতন নহেন। ফলে যা হবার তা হয়। গুরু হয় গুরুশিষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত। গুরু শিষ্যকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দিতে চান। শিষ্যও বসে থাকে না কিছু দায়ক দায়িকা বা আত্মীয় স্বজনের সমর্থন নিয়ে গুরুকে বিহার থেকে খেধানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে থাকেন। বাক্য প্রয়োগ বা অন্য উপায়ে গুরুশিষ্যকে বা শিষ্য গুরুকে বিহার থেকে তাড়াতে না পারলে শুরু হয় দলাদলি, সামাজিক, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং কোর্ট কাচারীর একাধিক মামলা মোকর্দ্দমা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক শুরু হয় গৃহীদের নমস্য পূজনীয় ভিক্ষু সংঘদের ধরপাকড় এবং কাঠ গড়ায়

হাতজোড় করে আসামীর আকুতি মিনতি। এ হচ্ছে দুঃখ মুক্তির কামনায় সংসার বিরাগী পূজনীয় বিহারাসক্ত ভিক্ষু সংঘের আচরণ। এ ক্ষেত্রে গুরু শিষ্যকে কেমন শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিষ্য গুরুদের থেকে কেমন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। গুরুকে সমর্থন করার যেমন ভিক্ষু সংঘ রয়েছে তেমনি শিষ্যকে দিক নির্দেশনা প্ররোচনা দেয়ার ও ভিক্ষু সংঘের অভাব নেই এ সমাজে। ভিক্ষু সংঘের এ সব দলাদলির জন্য নিরীহ দায়কদের ভোগান্তি ও কম নয়। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ আপনাদের শ্রামণ্য ধর্ম, প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদার লক্ষ্য কি ছিল এবং দীক্ষা গুরুর নিকট কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, তা একবার চোখ বুঝে স্মরণ করা অতীব দরকার বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি। ভারত সরকার কর্তৃক উচ্চ পর্য্যায়ের খেতাব পাওয়া "ভারতরত্ন সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরলোকগত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের মত বুদ্ধ দর্শন সম্পর্কিত প্রাজ্ঞ বৌদ্ধ মনিষা বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে কয়জন আছেন। বেশীরভাগ সময় ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করে এ মনীষা বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা, জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান দান এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করে শাসন সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। অথচ জীবনের মুমুর্ষ অবস্থায়ও এ মহামনীষার ধর্মাঙ্কুর বিহারে ঠাঁই হয়নি। অখ্যাত ভিক্ষু এবং গৃহী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছেন। হে বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ বিষয়টিকে কখনও আমলে নিয়েছেন। দুইশত সাতাশ শীলধারী পূজনীয় নমস্য ভিক্ষুদের কেমন ব্রহ্মবিহার, এ কেমন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা। অতি সাধারণ বিবেকবান মানবের এসব কথা ভাবতেও তো অবাক এবং লজ্জা লাগবার কথা। পূজনীয় বৌদ্ধ মনীষা শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থবিরের প্রতি বৌদ্ধ সমাজের এটা কি প্রতিদান। বুদ্ধের ধর্মের শুরুতে বিহার তৈরীকরণের প্রচলন ছিল না। পরবর্তীতে শ্রেষ্ঠী রাজা মহারাজারা ভিক্ষু সংঘের বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ শুরু করেছেন এবং অদ্যাবদি এ প্রচলন অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে কিনা জানিনা তবুও বলছি, আমরা যাঁরা চাকুরীজীবি তাঁদের জন্য কর্তৃপক্ষ একটা নিয়ম করেছেন যে, কোন কর্মচারী একজায়গায় বেশীদিন থাকলে সে জায়গায় সে কর্মচারী প্রভাব বিস্তার করে সরকারী কাজের অনেক সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সে জন্য প্রতি তিন বৎসর পর পর কর্মচারীদের বদলীর বিধান রয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে কম সময়েও বদলী করেন। এভাবে সংঘরাজ মহোদয় কর্তৃক মাঝে মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিহার থেকে বিহারাসক্ত ভিক্ষু সংঘকে স্থানান্তর করলে হয়তবা আসক্ত ক্ষয় করার মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

ভিক্ষু সংঘের মধ্যে নিকায়গত ভেদাভেদের জন্ম হয়েছে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাস্থবির মহোদয়ের এদেশে আগমণ এবং ভিক্ষু সংঘের শুদ্ধিকরণ অভিযানের জন্ম লগ্ন থেকে। ভিক্ষু সংঘের শুদ্ধিকরণ অভিযানের ফলে জন্ম নিয়েছে চিরস্থায়ী ভিক্ষু সংঘের রেষারেষী হিংসাবিদ্বেষ। শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাস্থবির মহোদয় এদেশে শুদ্ধিকরণ অভিযান করেছেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান ২০০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪০ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সংঘরাজ এবং মহাস্থবির নামে দুই নিকায়ের জন্ম হয়েছে। শুরু হয়েছে নিকায়গত ভিক্ষু সংঘের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ পরচর্চা। অহিংসা পরম ধর্ম না হয়ে হিংসা পরম ধর্মে পর্য্যবসিত হয়েছে। এক মঞ্চে বসে ধর্ম দেশনা, ধর্মীয় আচারাদি সম্পন্ন করা এবং একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সারমেধ মহাস্থবিরের শুদ্ধি অভিযান কতদিন আচরিত হয়েছিল আমার জানা নেই। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ অনুসরণ না করলে শুদ্ধি অভিযান করে লাভ কি? এক নিকায়ের ভিক্ষু অন্য নিকায়ের ভিক্ষুদের আচরণ নিয়ে দোষারোপ করেন। সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষু সংঘের কিছু কিছু ভিক্ষু বলেন মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুরা বিনয় মানেন না। আবার মহাস্থবির নিকায়ের কিছু কিছু ভিক্ষু বলেন যে, সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা ও বিনয় মানেন না। এভাবে দুই নিকায়ের ভিক্ষুসংঘ নানাবিধ উপমা সহকারে একে অন্যের দোষারোপ করেন। সুধী সমাজ ভেবে দেখুন বিনয়ের সঠিক ব্যবহার কোন জায়গায় আছে। আমি মনে করি সবই এক রংএর। আমরা প্রতিদিন ভিক্ষু সংঘের কাছ থেকে পঞ্চশীল গ্রহণ করলাম অথচ বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করলাম না। তাহলে শীল গ্রহণ করে লাভ কি হল? শুদ্ধি অভিযানেরও সে অবস্থা। সারমেধ মহাস্থবির শুদ্ধি অভিযান না করে বিনয়ের শিক্ষা প্রচার করলে হয়তবা আজকের নিকায়গত ভেদাভেদ সৃষ্টি হতো না এবং আজকে বাংলাদেশে দুই নিকায় না হয়ে এক নিকায় থাকলে এদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধদের অনেক উন্নতি হতো বলে আমার ধারণা। সারমেধ মহাস্থবিরের শুদ্ধি অভিযান থেকে এযাবত যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি তা মূল্যায়ন করে দেখলে হয়তবা কেউ কেউ বলবেন শুদ্ধি অভিযানে ভাল যা হয়েছে তার চেয়ে ভিক্ষু সংঘের ভেদ সৃষ্টিতে বরং ক্ষতিই বেশি হয়েছে। কারণ শুদ্ধি অভিযান তো আর শুদ্ধি থাকল না। সবার বিনয়তো এক রকমের হয়ে গেল। যেখান থেকে শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাস্থবির শুরু করেছিলেন একশত চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের পূজনীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয় সেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের

জায়গায় পৌঁছে গেছে। শুদ্ধি অভিযানের উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যা পেলাম তা হল ভিক্ষু সংঘের নিকায়গত ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, দায়কদের মধ্যে ও দলাদলি, রেষারেষি অনৈক্যতা। একতা না থাকার কারণে ভিক্ষু সংঘ এবং দায়কসংঘ আজ সর্বস্থানে পরাজয়ের গ্লানি টানতে টানতে নিজেরা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তবুও মিলনের কোন আভাষ নেই। এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিকায়গত পার্থক্য ভুলে গিয়ে সবাই এক হয়ে যাওয়া, মিলে যাওয়া। মিলে যাওয়ার মানসিকতা থাকলে এক মিনিটের বেশী সময় লাগার কথা নয়। যত তাড়াতাড়ি পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের মিলন হবে ততই বৌদ্ধজাতির মঙ্গল হবে। গোত্র যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন একতা থাকলে মহৎ কাজ এবং অসাধ্যসাধন করা অসম্ভব নহে। একতা ভঙ্গের কারণে শক্তিশালী বৃজিরা পরাজিত হয়েছেন। বৌদ্ধ ইতিহাসের এসব শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নৈষ্ক্রম্য পারমী পুর্ণ করার জন্য সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বন করেও সুখের সন্ধানে নেই বরং প্রতি মুহুর্তে অশান্তির দাবানলের বীজ বপন করা হচ্ছে, সংস্কার সৃষ্টি করা হচ্ছে, এ হচ্ছে বাস্তবতা। কোন পথে শান্তি বা মুক্তি নিহিত তা জানা হল না বা সে মার্গের চর্চাও নেই। ফলে গৃহী জীবন এবং সন্যাস জীবনের গতি প্রবাহ আজ এক ধারায় মিলিত হয়ে সত্যিকার বুদ্ধের ধর্ম দূরে সরে যাচ্ছে এবং বৌদ্ধদের স্বঘোষিত ধর্মের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্লভ মনুষ্য জন্মের সঞ্চিত কর্মের প্রবাহ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার হিসেব কে রাখে? বুদ্ধের জীবদ্দশায়ও পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে রাজা মহারাজা শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানদেয়া হতো বর্তমানে ও ভিক্ষু সংঘকে দায়ক কর্তৃক দান দেয়া হচ্ছে। এ দান পিন্ড ছাড়া ও নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী যেমন মালটোভা, হরলিক্স, ওভালটিন, ট্যাংগ এর বোতল, বিস্কিটের প্যাকেট, গ্লোকোজ, কলার কান্দি, নারিকেল, চাউল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন অষ্ট পরিস্কার সামগ্রী ব্যতীত এসব দানীয় ভিক্ষু সংঘে বিহারে মজুত রাখা কিংবা অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর করা বিনয় সম্মত কিনা এবং বিনয় বহির্ভূত কাজে কারা সহযোগতিা করছে এর হেতু কে বা কারা এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা করা দরকার। কোন কোন বৌদ্ধ চিন্তাবিদ এবং বুদ্ধের ধর্মের সূক্ষ্ম গবেষকগণের মত প্রকাশ করেন যে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদিতে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে অর্থ দান দেয়া নাকি বিনয় সম্মত নহে, কারণ এতে ভিক্ষু সংঘকে অর্থ সঞ্চয়ে এবং কেনা কাটার সুযোগ সৃষ্টি করে

দিয়ে অকুশল কর্ম সৃষ্টিতে সহায়তা করা হচ্ছে। এতে দাতা গণের পুণ্য সঞ্চয়ের পরিবর্তে পাপের ভাগী হচ্ছে নয়কি? এসব বিষয়গুলো আমাদের সুক্ষ্মদৃষ্টিতে ভেবে দেখা উচিত এবং এর থেকে উত্তোরনের একটা পথ বের করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। পুণ্য সঞ্চয় করতে অকুশল সংস্কার হচ্ছে কিনা সেটাও তলিয়ে দেখা দরকার। ভিক্ষু সংঘকে ফাং করে বিহারে রেখে বিনয়মতে চলার পথ সুগম করার দায়িত্ব কিন্তু দায়কদের রয়েছে।

এযাবত প্রথম পর্বে বুদ্ধ ধর্ম অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ করার পর যে ধর্ম ধারণ করেছেন প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন এবং সত্ত্বাদের দুঃখ মুক্তির জন্য যা নির্দেশ করেছেন আদেশ করেছেন ব্যক্ত করেছেন তা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বুদ্ধের ধর্মাবলম্বনকারীগণ অর্থাৎ বৌদ্ধরা বুদ্ধের ধর্ম পালন করতে গিয়ে যুগে যুগে নানা মুনির নানা মতের মতো অনেক মিথ্যা দৃষ্টি পূজা অর্চনা, তন্ত্রবিদ্যাসহ নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছেন। সত্যিকার অর্থে এসবগুলোতে বুদ্ধের আদেশ নির্দেশ ছিল না এবং এগুলো বুদ্ধের ধর্ম ও নহে। অথচ আমরা বুদ্ধের ধর্মের অজ্ঞতা বশতঃ এগুলোকে বুদ্ধের ধর্মের সাথে যুক্ত করে আচরণ করছি। ফলে দিন দিন সত্যিকার বুদ্ধের ধর্ম থেকে দূরে সরে বৌদ্ধদের নিজস্ব মনগড়া আচরণ ধর্মের দিকে অর্থাৎ নানা মুনির নানা মতের অনুসারীর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। বুদ্ধের ধর্ম এবং বৌদ্ধদের আচরণ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ বুদ্ধ দুঃখ মুক্তির জন্য কোন পথে চলার নির্দেশ দিয়েছেন আর আমরা বৌদ্ধরা বর্তমানে কোন পথে চলছি। এখানে কাউকে হেয় করে, খাটো করে দেখার জন্য নহে বরং সত্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা বা চিন্তা করার খোরাক যোগানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। কারণ বর্তমান সময় দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করার শ্রেষ্ঠ সময়। কারণ এ সময়ে ও জনগণ বুদ্ধের ধর্ম কি এবং এ ধর্মে বুদ্ধ কি বলেছেন কি বলেননি বুদ্ধ বিনয়ে কি আছে কি নেই সে সম্পর্কেও সচেতনতার জ্ঞান রয়েছে। এবং এ সম্পর্কে অনেক বৌদ্ধ মনীষীগণ ও তাঁদের ধর্ম দেশনায় এসব বলছেন। সত্যিকার বুদ্ধের ধর্ম আচরণ না করলে বৌদ্ধদের আচরিত ধর্মের মাধ্যমে দুর্লভ মনুষ্য জন্মে অযথা সময় অপচয় করলে দুঃখ মুক্তির পথ সুদূর পরাহত হবে। আমার এ লেখনীর উদ্দেশ্য কাউকে হেয় করে বা অবজ্ঞা করে দেখার জন্য নহে বরং বহুজনের হিত সুখ কামনায় এবং দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করার প্রয়াসে এবং সত্যিকার স্বধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার মায়ানী গ্রামে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর এক বৌদ্ধ পরিবারে ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিদ্যুৎসাহী প্রয়াত যুদিষ্টির বড়ুয়া এবং মাতা বিদর্শন সাধিকা মানদা বড়ুয়া। ডাঃ বড়ুয়া ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস-সি, এইচ (সম্মান), ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে ডি, এইচ, এম, এস (ঢাকা) এবং ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে নেদারল্যান্ডস থেকে আই, সি, পি, এইচ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ নিজামপুর কলেজে প্রভাষক পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মময় জীবন শুরু হয়। বর্তমানে তিনি বি,সি,এস (পশু সম্পদ) ক্যাডারের একজন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা। ডাঃ বড়ুয়া তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রয়াত পিতার নামে স্মৃতি ট্রাষ্ট করে ২০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর স্ব-গ্রামের ছেলেদের মধ্যে মেধা বৃত্তি প্রদান করেছেন। তিনি পশু সম্পদ বিভাগের একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হয়েও অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও বুদ্ধ ধর্মের চর্চা ও গবেষণা করে যাচ্ছেন। এ যাবত তিনি 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র ও মহা স্মৃতিপ্রস্থাপন সূত্র', 'বোধি পক্ষীয় ধর্ম', 'কার্য্যকারণ নীতি', 'অভিধর্ম গ্রন্থ পরিচিতি', 'রত্নগৃহ', 'অভিধর্মের সার সংক্ষেপ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন এবং আরো তিনটি গ্রন্থ প্রকাশনার পথে। নিজামপুর এলাকায় বিদর্শন ভাবনা চর্চায় তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি একজন অনাগারিক ব্রহ্মচারী এবং বহুজনের হিত সুখের জন্য সদ্ধর্মের প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারে এবং বহুজনের কল্যাণার্থে তাঁর নিরাময় দীর্ঘজীবন এবং বুদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আরও গবেষণামূলক লেখা কামনা করি।

বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া
গুমানমর্দ্দন, হাটহাজারী।